পিকেটির ভ্রূকুটি

মৈত্রীশ ঘটক

এক সময়ের বাম রাজনীতির প্রচলিত একটা স্লোগান ব্যবহার করে বলা যায়, টমাস পিকেটি তাঁর ক্যাপিটাল ইন দ্য টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি বইটির মাধ্যমে মূলধারার অর্থনীতির সদর দরজায় বাঁ দিক থেকে একটি কামান দেগেছেন। তবে কামানের গোলাটি বিশাল এবং কিঞ্চিত জটিল। একটি সমীক্ষায় জানা গেছে প্রায় সাতশো পাতার তথ্য ও বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ এই বইটি কিছুদিন বেস্টসেলার লিস্টে থাকলেও, অধিকাংশ সাধারণ পাঠক এর প্রথম পরিচ্ছদের পর আর বেশিদূর এগোননি।

অর্থনীতিচর্চার জগতে কিন্তু ভালো বা মন্দ যাই লাগুক, বইটাকে অগ্রাহ্য করার কোন উপায় নেই। বইটির নানা বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, একটা বিষয়ে প্রগতিশীল থেকে রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদেরা সবাই একমত। সরকারি নানা সূত্র থেকে আয় কর, জমির দলিল এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত তথ্য একত্র করে, প্রথমে ফ্রান্স তারপর পৃথিবীর নানা দেশে (তার মধ্যে ভারত-ও আছে) আয় এবং সম্পদের বৈষম্যের দীর্ঘমেয়াদি যে তথ্যভাণ্ডার পিকেটি ও তাঁর সহকর্মীরা (যাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ টোনি অ্যাটকিনসন এবং এমানুয়েল সায়েজ আছেন) প্রায় দুই দশক ধরে গড়ে তুলেছেন এবং গবেষকদের ব্যবহারের জন্যে অনায়াসলভ্য করে দিয়েছেন তা যথার্থই এক মহার্ঘ্য সম্পদ। এতাবৎ এই বিষয়ে যা তথ্যভিত্তিক কাজ হয়েছে (যেমন, ষাটের দশকে কুজনেৎস একজন পথিকৃৎ), দেশ ও কালের পরিধির বিস্তার এবং তথ্যসমৃদ্ধির দিক থেকে সে সবকে এই গবেষণা ছাপিয়ে গেছে।

এই বইটিতে আলোচিত বিষয়কে কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, এবং বিধান।

বইটিতে প্রথমে পরিসংখ্যানের মাধ্যমে অর্থনীতির কতগুলো মূল সূচকের দীর্ঘকালীন বিবর্তনের বর্ণনা (যা আমেরিকা বা ইয়োরোপের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে) করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে আয় ও সম্পদের বণ্টন, জাতীয় আয়ে পুঁজি এবং শ্রমের আপেক্ষিক ভাগ, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার ও সুদের হার। এখানে পিকেটি ও তাঁর সহগবেষকদের মূল অবদান হল, পরিবার-ভিত্তিক সমীক্ষার বাইরে গিয়ে কর-সংক্রান্ত নথি ব্যবহার করে আয়ের পরিসংখ্যানের বিকল্প তথ্য সংগ্রহ করা। এর দুটো সুবিধে। সমীক্ষার আওতায় অতি-ধনীরা প্রায় কখনই ধরা পড়েননা এবং অনেক দেশেই করব্যবস্থা চালু হয়েছে এই ধরণের সমীক্ষার প্রবর্তনের আগে। যেমন, আমেরিকায় আয় কর চালু হয়েছে ১৯১৩ থেকে, আর এই সমীক্ষা

শুরু হয়েছে ১৯৪৭ থেকে। তারপরে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো খাড়া করা হয়েছে, যাতে এই সূচকগুলোর বিবর্তন ও পরস্পরের মধ্যে কার্যকারণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যায়। এবং শেষে, বিশ্লেষণে পাওয়া ক্রমবর্ধমান অসাম্যের মোকাবিলা করতে পুঁজির ওপর বিশেষ করের প্রবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে, এবং কর এড়াতে তথ্যপ্রযুক্তির নয়া দুনিয়ায় অতি-সচল পুঁজির এক দেশ থেকে আরেক দেশে পালানোর প্রবণতা আটকাতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা আছে।

প্রথম অংশের আলোচনায় বইটির মূল বক্তব্য হল বর্তমানে আয় ও ধনের অসাম্যের মাত্রা প্রায় এক শতাব্দীর ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেখলেও, খুবই বেশি, এবং তা গত প্রায় অর্ধশতক ধরে (সত্তরের দশকের গোড়া থেকে শুরু করে আজ) ক্রমাগত বাড়তেই থেকেছে। তার আগে, ঐতিহাসিক কারণে (যেমন, গ্রেট ডিপ্রেশন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) অনেক ধনী সর্বস্বান্ত হওয়ায়, আর সরকারী নীতির কারণে (যেমন, আয় কর ব্যবস্থা ও আধুনিক কল্যানমূলক রাষ্ট্রের পত্তনের জন্যে) ১৯৩০ এর গোড়া থেকে ১৯৬০-এর শেষ অবধি অ্যামেরিকা এবং ইয়োরোপে অসাম্য কমেছিল । ধরা যাক আয় অনুযায়ী কোন দেশের সবাইকে আমরা সবচেয়ে বেশি থেকে সবচেয়ে কম এই বিন্যাসে সাজাই, এবং হিসেব করি আয়ের ক্রম অনুযায়ী জনসংখ্যার ওপরের দিকের ১০% বা ১% মোট আয়ের কত শতাংশ অর্জন করেছে। অ্যামেরিকার ক্ষেত্রে ২০১০ সালে এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০%। আর ওই একই ক্রমবিন্যাস ব্যবহার করে আমরা যদি জিজ্ঞেস করি, যে তলার দিকের ৫০% মোট আয়ের কত শতাংশ অর্জন করেছে, উত্তরটা হল, ২০% - অর্থাৎ, মোট আয় যদি একশো টাকা হয়, এবং জনসংখ্যা যদি একশো হয়, তাহলে সবচেয়ে ধনী ১০ জন পাচ্ছেন ৫০ টাকা, আর তলার দিকের ৫০ জন পাচ্ছেন মাত্র ২০ টাকা। সময়ের নিরিখে দেখলে, ১৯০০ সালে অ্যামেরিকায় ওপরের ১০%-এর আয়ের ভাগ ছিল এখনকার থেকে একটু কম, প্রায় ৪৬%, কিন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যে তা কমে দাঁড়িয়েছিল ৩৩%, তার পর থেকে বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় ৫০% এ ঠেকেছে। আর তুলনামূলকভাবে দেখলে, ১৯২০ থেকে ইয়োরোপে আয়ের অসাম্যের গতিমুখ মোটামুটি একই রকম হলেও, সবসময়েই তার মান অনেকটা কম থেকেছে। যেমন বর্তমানে ওপরের ১০%-এর আয়ের ভাগ হল ৩৫%।

বইটির দ্বিতীয় অবদান হল আয় আর ধনের যে ক্রমবর্ধমান অসাম্যের ছবি এই বইটিতে ফুটে ওঠে (ওপরে যার একটা চিলতে মাত্র উল্লেখ করেছি), তার একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খাড়া করা। এর মূলে আছে, পুঁজিসঞ্চয়ের ভূমিকা। ধরা যাক আপনি আয়ের দিক থেকে একজন গড় নাগরিক। তাহলে আপনার আয়ের বৃদ্ধির হার আর গড়পড়তা জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার

কাছাকাছি হবে। এবার ধরা যাক আপনার আয়ের সবটাই হল পুঁজি থেকে অর্জিত সুদ। তাহলে, আপনার আয়ের বৃদ্ধির হার আর সুদের হার কাছাকাছি হবে। পি কেটি দেখাচ্ছেন ঐতিহাসিক ভাবে সুদের হার প্রায় অধিকাংশ সময় বৃদ্ধির হারের থেকে বেশি থেকেছে । এবার যদি আপনি এই আয়ের প্রায় সবটা সঞ্চয় করেন, তাহলে সময়ের সাথে সাথে আপনার আয় গড় নাগরিকের আয়ের থেকে বাড়তেই থাকবে। তথ্যেও দেখা যাচ্ছে, সময়ের সাথে জাতীয় আয়ে পুঁজি-থেকে অর্জিত আয়ের ভাগ বেড়েছে। পিকেটি মনে করছেন যে ছবিটা এর থেকে ফুটে উঠছে তা মেধাতন্ত্রের নয়, উত্তরাধিকার-ভিত্তিক ধনতন্ত্রের (patrimonial capitalism)।

এবার আসি বইটির শেষ অংশে যেখানে এই ক্রমবৃদ্ধিমান অসাম্যের প্রতিকারের আলোচনা আছে। উদারপন্থী কেউ ভাবতেই পারেন, এখানে সমস্যাটা কি? কেউ যদি পরিশ্রম করে ধনসঞ্চয় করে এবং সেটা তার সন্তান-সন্ততিকে দিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করে, তাতে কার কি বলার আছে। শিক্ষিত বা সংস্কৃতিবান পরিবেশে বড় হবারও তো অনেক সুবিধে আছে, এবং এমন তো হতেই পারে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও অসাম্য বাড়ছে কিন্তু তাই বলে তো এগুলো সমানভাবে বেঁটে দেবার কথা কেউ বলেনা। সমস্যা হল, আর্থিক অসাম্য থেকে তৈরি হয় ক্ষমতা বা প্রভাবের অসাম্য। আর ক্ষমতার অসাম্য যত বাড়ে, আদর্শ নীতি আর বাস্তবে যে নীতি অবলম্বন করা হয় এবং রূপায়িত করা হয়, তাদের মধ্যে ফারাকও তত বাড়ে। আইনি ও বেআইনি অনেক পথে ধনীদের রাজনৈতিক প্রভাব মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের থেকে অনেক বেশি। তাই গণতন্ত্রে প্রত্যেক মানুষের একটা করে ভোট থাকলেও, মানুষে মানুষে অনেক ফারাক আছে, সব মানুষ নয়কো সমান। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। আমেরিকায় আয়করের সর্বোচ্চ হার হল ৩৫% আর পুঁজির দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের থেকে লাভের (capital gains) ওপর সর্বোচ্চ করের হার হল ১৫% । তাই, আদতে এই কর ব্যবস্থা প্রগতিশীল নয়, তার উল্টো। এই নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে ধনীদের তালিকায় যাঁর নাম ওপরের দিকে, সেই ওয়ারেন বাফেট লিখেছেন যে তাঁর আয়ের ওপর করের যে আনুপাতিক হার তা তাঁর সব কর্মচারীদের থেকে অনেক কম, কারণ তাঁর মোট আয়ের প্রায় সবটাই পুঁজির বিনিয়োগের থেকে। পিকেটির মতে, এই অসাম্য অনিবার্য নয় এবং করনীতির মাধ্যমে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ১৯৯২ সালে আমেরিকায় সর্বোচ্চ অর্জনকারী চারশো করদাতার গড়ে আয়ের ২৬% কর দিতে হত। প্রেসিডেন্ট বুশের করের হার কমানর নীতির ফলে, ২০০৯ সালে এই হার কমে দাঁড়ায় ২০%। যা কমান যায়, তা বাড়ানোয় যায়। ইয়োরোপেও অসাম্যের মাত্রা অ্যামেরিকার থেকে কম হবার খুব সহজ উত্তর হল, করের হারের ফারাক। পিকেটি পুঁ জির

ওপর যে বিশ্বব্যাপী করের প্রস্তাব দিয়েছেন, তার বাস্তবসম্মতা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে (পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ছবিটা খুব একটা উজ্জ্বল নয়)। কিন্তু সম্পদের ওপর কর বা আর্থিক সঙ্কটের সময় থেকে অতি-সচল পুঁজির লেনদেনের ওপর করের প্রস্তাব এখন অ্যামেরিকার মূলধারার আলোচনাতেও ঢুকে পড়েছে, যা কিছুদিন আগেও ভাবা যেতনা।

পিকেটির তথ্য-আহরণ এবং তথ্য-বিশ্লেষণ নিয়ে বিতর্কের খুব একটা অবকাশ না থাকলেও, আয় আর ধনের ক্রমবৃদ্ধিমান অসাম্যের ব্যাখ্যা নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। এই সব প্রশ্ন বা সংশয়ের সম্ভাব্যতা নিয়ে বেশ কয়েকটা তিনি নিজেই আলোচনা করেছেন, এবং নিজের তত্ত্ব অভ্রান্ত বা সর্বাঙ্গীণ এমন কোন দাবি তিনি করেন। পিকেটি নিজেই হিসেব করে দেখিয়েছেন যে গত চার দশকে অ্যামেরিকায় আয়ের সার্বিক অসাম্যের বৃদ্ধিতে পুঁজি-লব্ধ আয়ের অবদান এক-তৃতীয়াংশের বেশি নয়, যা তাঁর পুঁজি-কেন্দ্রিক তত্ত্বের সাথে পুরোপুরি খাপ খায়না। এখানে দক্ষ শ্রম থেকে অর্জিত আয়ের ক্রমবৃদ্ধিমান অসাম্যের একটা বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয় - যেমন ম্যানেজার বা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কারদের আয় সাধারণ শ্রমিকদের মজুরির তুলনায় প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে।

আয় ও ধনের ক্রমবৃদ্ধিমান অসাম্য নিয়ে পিকেটি যে গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ পেশ করেছেন, তা থেকে অস্বস্তিকর বেশ কিছু প্রশ্ন মূলধারার অর্থনীতির সুসজ্জিত প্রাঙ্গনে ঢুকে পড়ে। এই প্রথম দেখতে পাচ্ছি মূলধারার অর্থনীতিতে এমনকি রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদদের গবেষণাতেও অসাম্যের প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে নেওয়া হচ্ছে, "অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হলে সব ভালো হয়ে যাবে" বলে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছেনা। বামপন্থী অর্থনীতিবিদরা বলতেই পারেন, আমরা তো চিরকালই এসব বলে আসছি। কিন্তু পিকেটির তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ যে পরিচিত কিছু যুক্তিকে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, যতদিন না বামপন্থী অর্থনীতিবিদরা ধনতন্ত্রের সমস্যাগুলোর কোন গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবমুখী সমাধানের পথ দেখাতে পারবেন, যা সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কহীন কোন অলীক আদর্শের প্রতি আনুগত্য নয়, অর্থনীতিচর্চার এবং বৃহত্তর জগতে তাঁদের সম্ভাব্য প্রভাব সীমাবদ্ধই থেকে যাবে।

অর্থনীতির জগতের বাইরের পাঠকের জন্যেও পিকেটির এই বিশালবপু তথ্য-পরিসংখ্যান-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ন এই বইটি সব মিলিয়ে সুপাঠ্য। বহুচর্চিত হলেও বহুপঠিত কি না তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, বইটির আপাত-জনপ্রিয়তার কারণটা একটু ভেবে দেখা

দরকার। সাম্প্রতিক আর্থিক সংকট এবং তাতে ব্যাঙ্ক আর বিনিয়োগ সংস্থাগুলোর ভূমিকা অতি-ধনীদের প্রতি সাধারণ নাগরিকদের মনে এক গভীর বিরূপতা তৈরি করেছে। অ্যামেরিকায় আর্থিক বৈষম্য নিয়ে যে সামাজিক মনোভাব তা অনেকটাই পাল্টে গেছে - "ওপরের ১%" কথাটা এখন খুবই চালু একটা কথা। করদাতাদের অনুদান দিয়ে ব্যাঙ্কের লালবাতি জ্বলা আটকাতে হবে এইরকম "জিতলে ধনতন্ত্র কিন্তু হারলে সমাজতন্ত্র" মানসিকতার ফলে জনমানসে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এর আগে অ্যামেরিকায় করবৃদ্ধি শব্দটি কোন রাজনীতিক ব্যবহার করতে ভয় পেতেন, এখন সেই অবস্থা খানিকটা হলেও পাল্টেছে। আসলে, অসাম্যের প্রশ্নের সাথে ন্যায়ের প্রশ্নটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্থান, কাল ও পরিস্থিতিভেদে ভেদে কতটা অসাম্য সামাজিকভাবে সহনীয় বা বৈধ, অসাম্যের বিরুদ্ধে নীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শেষ বিচারে এর ভূমিকা বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, London & Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2014.

এই লেখাটি সংক্ষিপ্ত আকারে আনন্দবাজার পত্রিকার পুস্তক পরিচয় বিভাগে অক্টোবর ২৪, ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।